# দ্বিতীয় অধ্যায়

# ছোটগল্পকার হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীর আবির্ভাব ও ক্রমপরিনতি

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# ছোটগল্পকার হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীর আবির্ভাব ও ক্রমপরিণতি

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত গল্পকারদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আশাপূর্ণা দেবী। এমনকি স্ত্রী ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি বিশেষরূপে খ্যাত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যখন নারীদের শিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত নয় এবং কর্মজগতেও তাদের তেমন গতিবিধি নেই, সেই সময়েই আশাপূর্ণা দেবীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ধীরে ধীরে শুরু হয় সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর বলিষ্ঠ পদচারণা।

অন্যান্য অনেক লেখক-লেখিকার মতই আশাপূর্ণা দেবীও প্রথমদিকে শিশুদের জন্যই লিখতে শুরু করেন। প্রথম লেখার প্রকাশে যেমন আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠেন প্রত্যেকেই, তিনিও তেমনি প্রথমের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী নিজেই একথা বলে গিয়েছেন — "'প্রথম লেখা' যদি ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টির স্বাদ তো প্রথম বইতে প্রথম প্রেমের স্বাদ। যার জন্যে থাকে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা, অধীর আগ্রহের ব্যাকুলতা। এ সুখ তো দ্বিতীয়বার আসে না। এই জন্যেই না 'প্রথম' শব্দটাকে নিয়ে এত টানাটানি।" *(পৃ. ২২ — আর এক আশাপূর্ণা)*।

'শিশুসাথী' পত্রিকায় আশাপূর্ণা দেবী প্রথম 'বাইরের ডাক' (১৩২৯) নামে একটি কবিতা পাঠান এবং সেটি প্রকাশিতও হয়। এটি হল তাঁর প্রথম লেখা। এরপর থেকে শুরু হল গল্প লেখার পালা। ১৩২৯-১৩৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই লিখে গেছেন। এই সময়টাতে প্রেম - ভালোবাসা - বিরহ - মিলন এবং দেশাত্মবোধ তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করলেও শুধুমাত্র শিশুসাহিত্যই রচনার মধ্যেই নিজেকে নিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী তেরো বছর বয়স থেকে লেখা শুরু করেন। 'শিশুসাথী' ও আরো অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রায় তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে। বঙ্গদর্শনের সময় থেকে দেখা যাচ্ছে পত্রিকার সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়, এক্ষেত্রেও তার কোন অন্যথা ঘটে নি। তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসে 'ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' নামে। 'শিশুসাথী'র প্রকাশক বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স থেকে উদ্যোগ নিয়েই মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকা গল্প থেকে বাছাই করে এই গল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এভাবেই গল্প লেখার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে থাকে।

১৩৪৩ সালে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় 'পত্নী ও প্রেয়সী' নামে প্রথম বড়দের জন্য লেখেন ছোটগল্প। পত্রিকা সম্পাদক মন্মথ সান্যালের অনুরোধে আনন্দবাজারের সদ্য প্রকাশিত বিভাগ 'রবিবাসরীয়'র জন্য পুনরায় গল্প লেখেন। এভাবেই শুরু হয়ে যায় বড়দের জন্য গল্প লেখা। দু'বছর ধরে লিখে চলা গল্পগুলো সংগ্রহ করে 'দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং' আর একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করলেন 'জল আর আগুন' নামে। ছোটদের জন্য রচনাকে যদি কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনতে না চান তবে বলা চলে এই বইটিই তাঁর প্রথম বড়দের জন্য প্রকাশিত বই।

১৩৪৩ সাল থেকে গল্প লেখার পালা চলতে থাকে, তা উপন্যাসে গিয়ে রূপ পায় ১৩৫১ সালে। আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম উপন্যাস হল 'প্রেম ও প্রয়োজন' যা প্রকাশিত হয় 'কমলা পাবলিশিং' থেকে ১৩৫১ সালে। এরপর থেকে বেশ কিছু উপন্যাস লিখলেও তা আয়তনে ছোটই রয়ে যায় বলে তিনি মনে করেন।

এভাবে আশাপূর্ণা দেবী ছোটগল্প ও উপন্যাসের জগতে স্বচ্ছন্দ পদচারণা শুরু করেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলোতে পরিপক্কতার ছাপ সুস্পষ্ট না হলেও ক্রমশঃ তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। উপন্যাসের মত বড় ক্যানভাসকে গ্রহণ করে সেখানে জীবনের আলেখ্য অঙ্কনে সচেষ্ট হলেন। একে একে লিখলেন — 'মিত্তির বাড়ি', 'বলয় গ্রাস', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'শশীবাবুর সংসার', 'অতিক্রান্ত' প্রভৃতির মতো উপন্যাস।

আশাপূর্ণা দেবীকে যা আবাল্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করেছে তা হচ্ছে নারী পুরুষের বৈষম্য এবং নারীর অধিকারহীনতা। এই প্রশ্নকে, যন্ত্রণাকে তিনি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য আরো বড় ক্যানভাসকে গ্রহণ করেন যা 'ট্রিলজি' বা 'ত্রয়ী' উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৪ সালে তেতাল্লিশতম উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' তে ঘটে তাঁর সেই ইচ্ছার প্রথম প্রকাশ। ছাপ্পান্নতম উপন্যাস 'সুবর্ণলতা' ও পঁচানব্বইতম উপন্যাস 'বকুলকথা' তে ঘটে তার পরিণতি।

প্রায় দুইশত উপন্যাস তিনি লিখেছেন আর ছোটগল্প লিখেছেন দেড় সহস্রের মত। তিনি বলেছেন 'ছোটগল্পই আমার প্রথম প্রেম'। লিখে চলার মধ্যে যে ভাবটা তাঁর মনে সর্বদাই জেগে ওঠে তা হচ্ছে নিত্য নতুন কথার ঢেউ। যা নাকি সর্বদা বলে ওঠা হয় না। তৈরি হয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম অনুভূতি, যাকে উপন্যাসের মধ্যে সর্বদা ঠাঁই দেওয়া যায় না। লিখতে লিখতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেলেও এই ক্ষুদ্র অনুভূতিগুলোকে সজীব করে তুলতেন ছোটগল্পের মধ্যে। অর্থাৎ জীবনকে যেমন বড় ক্যানভাসের মধ্যে রেখে তার সামগ্রিক রূপকে তুলে ধরা যায়, আবার জীবন যে অনেক নিজস্ব ছোটখাটো সুখ-দুঃখ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-ঈর্ষার দোলায় দোলে তার আলেখ্য অঙ্কনে ছোটগল্পের মতো ছোট ক্যানভাসেরও প্রয়োজন হয়।

১৩৪৩ সাল থেকে আজীবন ছোটগল্প রচনার মধ্যে তাঁর যে বিষয় বৈচিত্র ও পর্যবেক্ষণের

গভীরতা দেখা যায়, তা আমাদের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে নয়, শিল্প-সামর্থ্যের বাহাদুরিতেও তিনি ক্রমশঃ পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর রচিত গল্পগুলো বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে সেখানে নানাদিক রয়েছে। যদিও প্রতিবাদের ঝোঁকটাই সেখানে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও রয়েছে — শিশুবিষয়ক রচনা, দাম্পত্য জীবনের নানা দিক, হাস্যরসের গল্প, ব্যঙ্গ রসাত্মক গল্প এবং প্রেমের গল্প।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে যেমন ছোটগল্প সার্থক রূপ পায় তেমনি প্রতিবাদী চেতনার গল্পও তাঁর লেখায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আশাপূর্ণা দেবীর রচনাতেও প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে ওঠে। সত্য উন্মোচনে নির্মম ছিলেন বলেই হয়ত প্রতিবাদের আলোয় তাঁর চরিত্ররা ঝলসে উঠেছে। তাঁর ভিতরকার আপসহীন বিদ্রোহই ক্রমাগত তাঁকে উজ্জ্বল পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল। তাঁর অন্তরস্থিত যে তৃষ্ণা, তা হচ্ছে নারীমুক্তির তৃষ্ণা, এর ফলেই জন্ম নেয় চিরন্তনী সব নারীরা। যেমন 'সর্পশিশু'র ফেলী, 'ছিন্নমস্তা'র জয়াবতী, 'অঙ্গার'-এর নতুন বৌ, 'নিরুপমা'র নিরুপমা, 'অবিনশ্বর' গল্পে পদ্মা, 'তাসের ঘর' গল্পে মমতার মতো চরিত্র। আবার 'অভিনেত্রী' গল্পে অনুপমার মত চরিত্র সৃষ্টি করে দ্বিধাহীনভাবে সরবে বলেছেন — "নারীমাত্রেই কি অভিনেত্রী নয়?"

**হাস্যরসাত্মক গল্পও** তিনি যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে রচনা করেছেন। যেমন — সিঁধকাঠি, নব কথামালা, বিস্ফোরণ, পূর্বরাগে রসনার স্থান, হাসির গল্প প্রভৃতি। গল্পগুলো হাস্যরসের সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্বারা খচিত এবং মজার আবরণে আবৃত। আশাপূর্ণা দেবী হাস্যরসের গল্পেও এভাবে স্বকীয়তা নিয়ে আসেন। যেমন, 'হাসির গল্প' তে হাসির গল্প লেখার অছিলায় মধ্যবিত্ত সংসারের চালচিত্রটাকে হালকা চালে দেখিয়েছেন। কেমনভাবে লঘু চাপল্যের ভিতর দিয়েই সত্যরূপটা বিকশিত হয়ে ওঠে তাই তিনি তুলে ধরেছেন। **ব্যঙ্গধর্মী রচনাও** আশাপূর্ণা দেবীর রচনার একটি বিশেষ ধারা। কাহিনির উপরিতলে মনে হচ্ছে কোন চরিত্রের প্রতি মমতা প্রদর্শন করা হচ্ছে কিন্তু তা যেন কোথাও গিয়ে মর্মে আঘাত করছে বলেও মনে হয়। যেমন 'স্বজাতি' গল্পে শিবানীকে বৈধব্যের সাজে সজ্জিত করে তোলার মধ্য দিয়ে মমতার প্রস্রবণ বয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, বরং অসহায় স্বামী পরিত্যক্তা একটি মেয়ের কাছ থেকে তার ন্যূনতম চাহিদাটুকুও কেড়ে নেবার যে আনন্দ — তাকেই ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। 'লালাশাড়ী' তে বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যুর চেয়ে নিষ্ঠুর, অপদার্থ স্বামীর একখানি লাল চেলির জন্য শোক অকূল প্লাবী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নারীদের মূল্যটা যে কত হীন পর্যায়ে চলে গিয়েছে তাই উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন। 'সভ্যতার সংকট', 'কঙ্কণ', 'স্বপ্নভঙ্গ', 'জনসমুদ্র' প্রভৃতি গল্পে ব্যঙ্গধর্মীতার আরো নিদর্শন পাওয়া যায়। কি হতে পারত তা নয়, ব্যঙ্গের মধ্য দিয়েও সমাজে কি ঘটছে সেই চালচিত্রটাকেই তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর গল্পের চরিত্রদের ভেতর থেকে মর্মোদ্‌ঘাটন নয়, বাইরে থেকে তীব্র কশাঘাত করে আক্রমণ চালিয়েছেন। ব্যঙ্গাত্মক লেখিকা

রূপেও সেখানে তিনি সার্থক হয়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে নেই অতিপ্রাকৃতের কোন স্পর্শ, নেই প্রকৃতির পদচারণা ও ধর্মীয় অনুশাসনের কোন ছুৎমার্গ। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে অপশাসনের একটা হতশ্রী দিক রয়েছে, যার মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণটাই বেশি দেখা যায়, তিনি তাকেই প্রকাশ করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলোর বিভিন্ন ধারা থাকলেও আলোচনার মূলপর্বে রয়েছে গল্পের মধ্যে অন্তর্নিহিত অবস্থায় যে জীবন দেখা যায়, তারই বিশ্লেষণ। আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা ঘটনার মাধ্যমে নারীদের প্রতি মানুষের মনোভাব এবং নারীদের নিজেদের কোন দিকটি সমস্যা কন্টকিত সেদিকেই তিনি আলোকপাত করেছেন। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পরাজির মধ্যে কোন্ জীবনদৃষ্টিতে নারীদের দেখছেন, সেই বিষয়টাই আলোচনার মূল বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী কখনো বাংলাভাষা ছাড়া অন্যভাষায় কোন রচনা করেননি। এ সম্পর্কে নাট্যাভিনেতা জগন্নাথ বসুর একটি বিবৃতিতে পাওয়া যায় — জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাবার পর আকাশবাণীতে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার ছিল। ফেরার পথে রেডিও অধিকর্তা কয়সার কলন্দর সাহেবের একান্ত ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করতে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বাড়িতে যান। কিন্তু কয়সার সাহেবের হিন্দি প্রশ্নের উত্তর তিনি বাংলাতেই দিয়েছিলেন এবং এতদিন বাংলায় কাজ করেও বাংলাভাষা রপ্ত করতে না পারাটা যে অশোভন সেটা কয়সার কলন্দরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম দিকের গল্পগুলোতে জীবন ভাবনার গভীরতা অল্প হলেও পরবর্তী রচনায় অতলান্তিক গভীরতা, প্রখর সংবেদনশীলতা, ও পরিপূর্ণতার ছাপ রয়েছে। তাঁর লেখনীর তীক্ষ্ম ক্ষুরধার অন্তর্বিশ্লেষণেই ক্রমপরিণতির দিকটি পরিলক্ষিত হয়। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাই তাঁর রচনার বিষয় হওয়াতে তা কখনো বড় ক্যানভাস অর্থাৎ উপন্যাসের অন্তর্গত হয়েছে আবার কখনো তার খণ্ডচিত্র ছোটগল্পেরও বিষয় হয়ে উঠেছে। যেহেতু সংসার জীবনের বাইরে তিনি যাননি তাই অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে গল্পের বিষয়বস্তু এক কিন্তু আসলে কোথাও এর মূলসুরে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গল্পের কালানুক্রম অনুযায়ী সবসময় আবার পরিণতির ক্রম নির্ধারণ করা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় সাহিত্য রচনার মধ্যগগনে যখন বিরাজ করছেন তখন যে ধরনের গল্প লিখছেন তার চেয়ে আরো পূর্ববর্তীকালের রচনাটির উৎকর্ষতার গাম্ভীর্য অনেক বেশি। যেমন ১৩৫২ সালে রচিত 'না' গল্প আর ১৩৬৯-৭১ এর মধ্যে একসময় লেখা 'নারী প্রকৃতি' গল্পের মধ্যে জীবন ভাবনার গভীরতা 'না' গল্পেই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাই মূল আলোচনাতে এই কালানুক্রমের ধারা সর্বদা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে যে স্বতন্ত্রতা তা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে। গল্পগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখিকার জীবনদৃষ্টির বিশেষ রূপকে অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।